বিজ্ঞান শিশুতোষ সিরিজ

বুক - ৩

আলোকবিজ্ঞান

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
ডিপ্লোমা ইন সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, এইচ.সি.এফ.ই., ইংল্যান্ড।

Internet Edition



প্রকাশকের কথা

বিজ্ঞান একটি চিত্তাকর্ষক বিষয়। শিশু-কিশোররা এ বিষয়ে জানতে খুব আগ্রহী। বিজ্ঞান আমাদেরকে জতৎসৃষ্টির কৌশলাদি উন্মুক্ত করেছে। বিজ্ঞানের নির্যাস হচ্ছে প্রযুক্তি। আর প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে চলছে। নিত্য-নতুন যন্ত্রাদি আবিষ্কার করে চমক লাগাচ্ছে। দ্রুত গড়ে তুলছে বিজ্ঞান ও উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক এক অবিশ্বাস্য বিশ্বসমাজ।

আমাদের শিশু-কিশোররা বিজ্ঞানের প্রতি দিন দিন বেশি বেশিকরে আগ্রহশীল হয়ে ওঠছে। এর ফলে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হচ্ছে। তবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক বিষয়ের ওপর পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জনের সুযোগ-সুবিধা আমাদের সোনামণি শিশু-কিশোররা এখনও তেমনটি পাচ্ছে না। বিশেষকরে বাংলা ভাষায় শিশু-কিশোরদের জন্য বিজ্ঞানের বইয়ের অত্যন্ত অভাব রয়ে গেছে। বর্তমান এই শিশুতোষ সিরিজ সে অভাব পূরণে কিছুটা হলে অবদান রাখবে এটাই আশা।

লেখক ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী সত্তুর দশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর ইংল্যান্ডে উচ্চতর ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন। তিনি বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি বিজ্ঞানের বইও আছে। তার রচিত 'সবার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' নামক একটি বই ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সিরিজে গ্রন্থের সংখ্যা অন্তত ১০টি হবে বলে আমরা আশাবাদী। আমরা সবার নিকট দুআ প্রার্থী।



প্রকাশক: মমতাজ বেগম বারী
প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ মে, ২০১৮।
অঙ্গসজ্জা ও বর্ণবিন্যাস: গ্রন্থকার।

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী
আলী সেন্টার, সুবিদবাজার, সিলেট।

Biggan Shishutush Series: Book 3, "Alokbiggan" [Lights] by Engineer Azizul Bari, Dip. Sci. & Tech. England. Published by "KHANQA-E-AMINIA-ASGARIA", Ali Center, Subidbazar, Sylhet. First edition: May 2018. Price: Taka 50.00 only.

আলোকবিজ্ঞান

পদার্থ বিজ্ঞানের একটি শাখার নাম আলোকবিজ্ঞান। তবে আগে জেনে নিই পদার্থ বিজ্ঞান বলতে কী বুঝায়? একে ইংরেজিতে 'Physics' বলে। আমরা পুরো বিশ্বব্যাপি অসংখ্য বস্তু দেখতে পাই। আরো অনেক বস্তু আছে যা আমাদের দেখার বাইরে। সবগুলো বস্তুই কিন্তু গতিশীল। বস্তু উদ্যম বা এনার্জি এবং বলের (ফোর্সের) সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করছে সদা-সর্বদা। বস্তুর পরিচিতি, গতিশীলতা ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে যে বিজ্ঞান অনুসন্ধান ও গবেষণা করে তার নামই হচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞান।



পদার্থ বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা

পদার্থ বিজ্ঞানের অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। এর মধ্যে মূল কটি হলো: (ক) আলোকবিজ্ঞান (Light Optics), (খ) গতি (motion) (গ) কাজ ও এনার্জি (Work and Energy), (ঘ) তরঙ্গ ও ধ্বনি (Waves and Sounds), (ঙ) বিদ্যুৎ ও চুম্বক (Electricity and Magnetism) এবং (চ) জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy)।

বর্তমান বইয়ে আমরা প্রথমটি তথা আলোকবিজ্ঞানের ওপর অনেক কিছু জানবো। ভবিষ্যতে আশা রাখছি একে একে বাকি প্রতিটি শাখার ওপরও একেকটি বই রচনা করবো। তোমরা দু'আ করো- কেমন?

আলোর বিজ্ঞান



আলো আসলে কী? প্রশ্নটির উত্তর সহজ নয়। তবে চিন্তার কারণ নেই। এ বই পড়ে তোমরা সঠিক জবাব পেয়ে যাবে। খুব মনোযোগসহ পাঠ করবে ও ছবিগুলো দেখবে।

আলোকের কোনো ওজন নেই। একে সত্যিকার অর্থে বস্তুও বলা যায় না। কেউ কেউ এমনও প্রশ্ন করেন: তাহলে আলো বলতে কিছু আছে কী? অবশ্যই আছে! আলো ছাড়া আমরা বাঁচতাম না। আজকের বিজ্ঞান বলে, আলো মূলত এক ধরনের এনার্জি বা উদ্যম যা তৈরি হয়েছে ফটোন (photon) নামক অসংখ্য প্যাকেট দ্বারা। ভেবো না, ফটোন কী একটু পরই বুঝতে পারবে। আলো একটি একক জিনিস যা একই সময় তরঙ্গ ও কণা হিসেবে আচরণ দেখায়।

পাশের চিত্র থেকে দুটি ব্যাপার স্পষ্ট:

(১) আলো যখন কণার আচরণ করে তখন এটা সোজা চলে।

(২) আলো যখন তরঙ্গের আচরণ করে তখন এটা বক্র হতে পারে।

লক্ষ করো এই দ্বৈত আচরণ কিভাবে সম্ভ ব তা আমাদের বোধে আসে না! কিন্তু



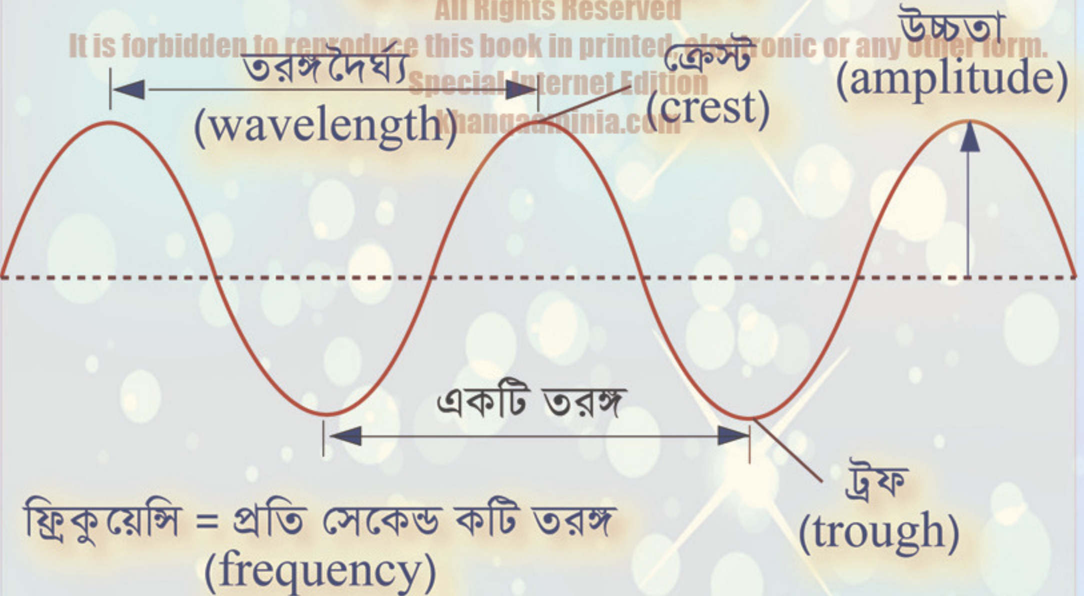
আলোর দুটি চরিত্রঃ কণা ও তরঙ্গ।

এটাই বাস্তবতা- বিজ্ঞানীরা একে গ্রহণ করে নিয়েছেন। আলোর মধ্যে অবশ্য আরো কিছু মৌলিক গুণাবলী আছে। যেমন:

(ক) এটার মধ্যে আছে এনার্জি (উদ্যম) যার নাম বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয় এনার্জি (electromagnetic energy)। ইলেকট্রম্যাগনেটিক এনার্জির অন্যান্য উদাহরণ হলো: রেডিও (radio), মাইক্রওয়েভ (microwave), আলট্রাভায়োলেট (ultraviolet - UV), এক্স-রে (X-ray) ও গামা রে (gamma ray) ইত্যাদি। এই প্রতিটির ওপর আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা সময়মতো করবো। আপাতত এটা জেনে নাও যে, এই প্রত্যেকটি হলো আলোকরশ্মির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সবগুলো আমরা দেখতে পাই না। আমাদের চোখ সে যোগ্যতা রাখে না। যেটুকু দেখতে পাই তাকে বলে 'দৃশ্যমান আলো' (visible light)।

(খ) আলো থেকে সৃষ্ট ইলেকট্রম্যাগনেটিক এনার্জি তরঙ্গ হিসেবে চলে।

(i) তরঙ্গ একে অন্যটি থেকে ভিন্ন যাকে 'তরঙ্গদৈর্ঘ্য' (wavelength) বলে। দুটি তরঙ্গের মধ্যে দূরত্বই হচ্ছে ওয়েভলেন্থ।



(ii) তরঙ্গের সর্বোচ্চ বিন্দুকে ক্রেস্ট (crest) বলে।

(iii) তরঙ্গের সর্বনিম্ন বিন্দুকে ট্রফ (trough) বলে।

(iii) তরঙ্গের উচ্চতাকে এ্যামপ্লিটিউড (amplitude) বলে।

(iv) নির্দিষ্ট সময়ে কটি তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তাকে বলে (frequency)।

(v) ওয়েভলেন্থ যতো কম ও যতো বেশি- ততো বেশি এনার্জি।

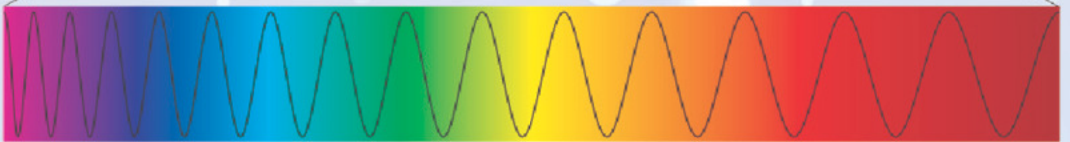
(vi) রেডিও তরঙ্গ ফুটবল মাটের সমান দীর্ঘ। এর ফ্রিকুয়েন্সি ও এনাজি কম।

(vii) গামা রে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য একটি অণু থেকেও কম। এর ফ্রিকুয়েন্সি ও এনার্জি খুব বেশি।

(viii) দৃশ্যমান আলো পুরো ইলেকট্রম্যাগনেটিক ব্যাপ্তির (যাকে স্পেকট্রাম বলে) তুলনায় এক-মিলিয়নের এক শতাংশ মাত্র। দৃশ্যমান আলো মূলত রঙের মিশ্রণ। সবগুলো একত্র হয়ে 'সাদা' আলো সৃষ্টি করেছে। কোনো তিনফলা কাচের ভেতর দিয়ে সাদা আলো চলে গেলে তা ৭ রঙে বিভক্ত হয়ে অপরদিকে বেরিয়ে আসে। অনুরূপ রংধনুতে হয়ে থাকে।



ইলেকট্রম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম



বস্তু ও আলোকরশ্মি


আলোকভেদ্য বস্তু

(১) আলোকভেদ্য বস্তু: যেসব বস্তুর মধ্য দিয়ে আলো সহজে চলে যেতে পারে ওগুলো হচ্ছে আলোকভেদ্য (transparent) বস্তু। যেমন: স্বচ্ছ কাচ।

(২) আলোকনিরোধক বস্তু: যেসব বস্তু আলোকরশ্মিকে ফিরিয়ে দেয় তথা প্রতিবিম্ব করে ওগুলো হচ্ছে আলোকনিরোধক (opaque)। যেমন: তোমার দেহ এবং আয়না।

(৩) অস্বচ্ছ আলোকপ্রবাহী: যেসব বস্তু একই আলোকভেদ্য ও আলোকনিরোধক ওগুলোকে বলে অস্বচ্ছ আলোকবাহী (translucent)। এসব বস্তু অংশুজালকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। যেমন: পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল।


আমাদের বায়ুমণ্ডল অস্বচ্ছ আলোকপ্রবাহী


আলোকনিরোধক বস্তু সৃষ্টি করে ছায়া

আলোকের গতি

জগতের সর্বোচ্চ গতির অধিকারী হচ্ছে আলো। প্রত্যেক সেকেন্ডে আলো ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল (৩ লক্ষ কিলোমিটার) পর্যন্ত চলে যায়! আমাদের সূর্য পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করছে। আলো এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে সময় নেয় ৮ মিনিট মাত্র। আর চাঁদ থেকে আলো আসতে মাত্র ১.৩ সেকেন্ড সময় লাগে! চাঁদও কিন্তু প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল দূরে। তবে ভাবার ব্যাপার, মহাকাশে এমন কিছু তারা ও তারাজগৎ আছে যারা এতো বেশি দূরে অবস্থান করে যে, কিলোমিটার বা মাইলের দ্বারা মাপাই সম্ভব নয়! সে ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় 'আলোক বছর' নামক একটি ইউনিট। এর অর্থ হলো এক বছরে আলো যতটুকু দূরে চলতে পারে সে বিরাট সংখ্যাটি। আর জেনে রাখো, আমাদের সৌরজগৎ থেকে নিকটতম তারার দূরত্ব হচ্ছে চার আলোক বছর! অর্থাৎ ঐ তারা থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে দীর্ঘ চার বছর।


আলোকের গতি ৩ লক্ষ কি.মি. প্রতি সেকেন্ড!


নিকটতম তারা প্রক্সিমা সেন্টোরি

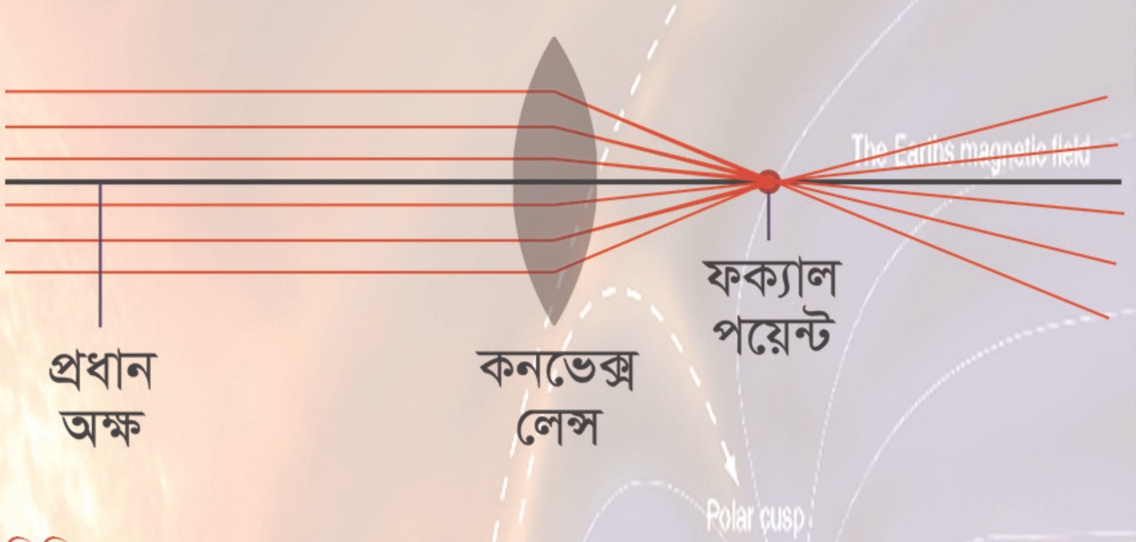
আলোকের দিক পরিবর্তন

সাধারণত আলোকরশ্মি সরল পথে চলে। তবে বস্তুর ভেতর দিয়ে চলার সময় বাঁকা হতেও পারে। এভাবে দিক পরিবর্তন হওয়াকে বলে রিফ্র্যাকশন (refraction) বা বাঁকানো। কতটুকু বেঁকে যাবে, তা নির্ভর করে কোন্ মাধ্যমের ওপর আলোকরশ্মি চলমান আছে।



লেন্স ও আলোকের রিফ্র্যাকশন

লেন্স হচ্ছে বক্র কাচ বা প্লাস্টিক। চোখের লেন্স, দূরবীক্ষণযন্ত্র, অণুবীক্ষণযন্ত্র ও চশমার লেন্স দ্বারা আমরা দূরের বস্তু কাছে এবং অস্বচ্ছ বস্তু স্বচ্ছভাবে দেখতে পাই। এসব যন্ত্রে আলোকের রিফ্র্যাকশন গুণকে কাজে লাগানো হয়।



বিভিন্ন ধরনের লেন্স

বিভিন্ন উপায়ে লেন্সকে শ্রেণি বিন্যস্ত করা যায়। এর একটি হচ্ছে কিভাবে রশ্মি বক্র হয় তা নির্ণয় করা।

(১) কনভারর্জিং (converging) বা সমকেন্দ্রীমুখী লেন্স

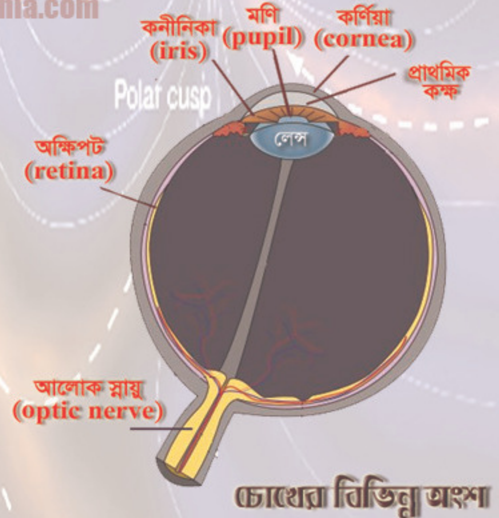
এরা আলোকরশ্মিকে একটি বিশেষ বিন্দুতে নিয়ে যায়- যার নাম ফোক্যাল পয়েন্ট (focal piont)। এরূপ লেন্সের আরেক নাম পজিটিভ (positive - ধনাত্মক) লেন্স।

(২) ডাইভার্জিং (diverging) বা অপসরণশীল লেন্স

ডাইভার্জিং লেন্স বিশেষ ফোক্যাল পয়েন্ট থেকে আলোকরশ্মি বাইরের দিকে ছাড়িয়ে দেয়। এরূপ লেন্সকে নেগিটিভ (negative - ঋণাত্মক) লেন্সও বলে।

চোখ ও দেখা

চোখে দেখা ৫টি ইন্দ্রিয়ের একটি। বাকিগুলোর নাম: স্বাদ, গন্ধ, ছোঁয়া ও শুনা। পঞ্চেন্দ্রিয় সম্পর্কে অন্য কোনো বইয়ে আলোচনা করবো।



চোখের বিভিন্ন অংশ

পূর্বের পৃষ্ঠার ছবিতে চোখের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অংশ দেখানো হয়েছে। এসব অংশের কাজ কী? এসো, জেনে নেই।

(১) অক্ষিপট (retina): চোখ-বলের পেছনে এটি অবস্থিত। আলোকরশ্মি চোখে প্রবেশ করে পানীয় বস্তু পেরিয়ে রেটিনা বা অক্ষিপটে পতিত হয়। অক্ষিপটের কাজ হলো আলোকরশ্মিকে সিগনালে পরিণত করা যাতেকরে আমাদের মগজ তা সনাক্ত করতে পারে। অক্ষিপটে 'রড' ও 'কৌণ' নামক আলোক-সংবেদী কোষ আছে। রড অন্ধকারকে সনাক্ত করে এবং কৌণ সনাক্ত করে বিভিন্ন রঙ। তিনটি প্রাথমিক রঙের জন্য তিন ধরনের কৌণ আছে। প্রাথমিক রঙ হলো লাল, হলুদ ও নীল। তিন কৌণে তিন রঙ সনাক্ত করে, তাই আমরা রঙিন বস্তু দেখতে পাই।



(২) লেন্স (lens): আমাদের চোখের সামনদিকে একটি লেন্স আছে। এর কাজ হলো আলোকরশ্মিকে ভেতরে নিয়ে একটি বিন্দুতে স্থির তথা ফোকাস করা। কিভাবে আলোকে ফোকাস করতে হবে সে নির্দেশনা আসে আমাদের মগজ থেকে। ঠিক যেভাবে একটি ক্যামেরা কিংবা মাইক্রোস্কোপের লেন্সের দূরত্বে পরিবর্তন এনে আমরা সামনের দৃশ্যকে স্পষ্ট করার জন্য ফোকাস করি, তদ্রূপ মগজও চোখের লেন্সকে নড়াচড়া করে ফোকাস করে। তবে লেন্সের পেশি যখন সঠিকভাবে ফোকাস করতে ব্যর্থ হয় তখনই আমাদের প্রয়োজন পড়ে চশমার।

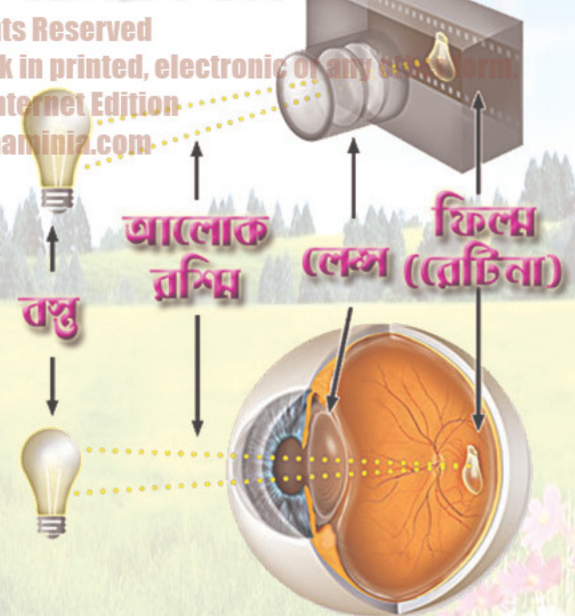
(৩) কনীনিকা (iris): চোখের কর্ণিয়া, অভ্যন্তরীণ কক্ষ পরেই কনীনিকার স্থান। এটা পাতলা বক্রাকার বস্তু। লেন্সের উপরে স্থাপিত চোখের মণির ব্যাস ও আয়তন নিয়ন্ত্রণ

করা হচ্ছে এর কাজ। এভাবে নিয়ন্ত্রণের ফলে সঠিক পরিমাণ আলোকরশ্মি অক্ষিপটে যেয়ে পৌঁছুতে পারে। কনীনিকা দ্বারা চোখের রংও নির্দিষ্ট হয়।

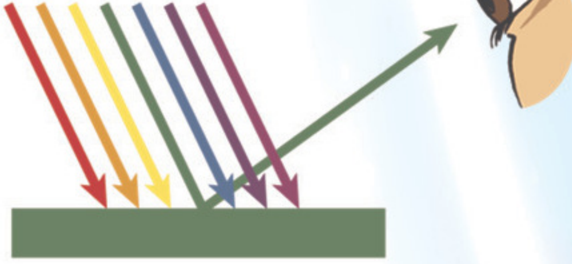
(৪) মণি (pupil): আইরিস বা কনীনিকার মধ্যে একটি ছিদ্রই হচ্ছে চোখের মণি। এ ছিদ্র দিয়ে আলোকরশ্মি লেন্সে পতিত হয়। বাইর থেকে চোখের ঠিক মাঝখানে যে কালো বৃত্ত দেখা যায়, ওঠাই হলো মণি।

(৫) কর্ণিয়া (cornea): কর্ণিয়া চোখের সর্বাধিক বাইরের লেন্স হিসেবে কাজ করে। যেমন আলো চোখের ভেতর প্রবেশের একটি জানালা। চোখের মোট ফোকাসের ৬৫ থেকে ৭৬ শতাংশ কর্ণিয়ার নিয়ন্ত্রণে। যখনই কর্ণিয়ার ওপর এসে আলোকরশ্মি পতিত হয়, তখনই তা বক্র হয়ে পড়ে। অর্থাৎ আলোকরশ্মি রিফ্র্যাক্ট হয়ে নিচের লেন্সে পতিত হয়।

(৬) আলোক স্নায়ু (optic nerve): আলোক স্নায়ু চোখকে মগজের সঙ্গে যুক্ত করেছে। ফলে আমরা (মগজের মাধ্যমে) দেখতে সক্ষম হই। আলো থেকে রেটিনা বা অক্ষিপটে সৃষ্ট ঘাত (impulse) বহন করে নেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে আলোক স্নায়ুর। আলোকসৃষ্ট ঘাত-প্রতিঘাত অপটিক নার্ভ হয়ে ব্রেনে যেয়ে পৌঁছুলেই আমরা দৃশ্যটি দেখতে পাই। সুতরাং মগজ কর্তৃক 'দেখার' নিশ্চয়তা প্রদান করে অপটিক নার্ভ বা আলোক স্নায়ু।



রং দেখা



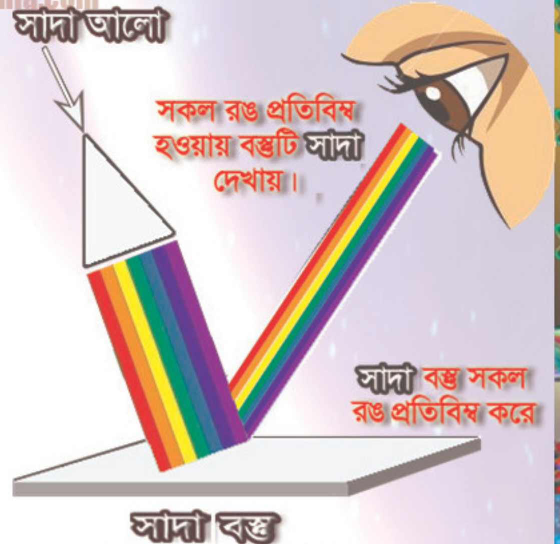
আমরা চতুর্দিকে সবকিছু রঙিন দেখতে পাই। ভেবে দেখেছো কি রঙ দেখার কারণ কী? বা কীভাবে আমরা রঙ দেখি?

সবকিছু রঙিন

আমরা সাদা-কালোও দেখি। তাহলে সবকিছু রঙিন হলো কীভাবে? আসলে আলোর রঙও মূলত রঙিন। বস্তুর ওপর নির্ভর করে আমরা কোন্ রঙে এটা দেখবো। সকল বস্তুর মধ্যে কিছু মৌলিক গুণাবলী আছে। এর মধ্যে একটি হলো তার রঞ্জক পদার্থ (pigment)।

আলোকসূত্র থেকে আগত ৭ রংয়ের যেগুলো বস্তু শুষে নেয় সেগুলো আমরা দেখতে পাই না। তবে বস্তু যে রংকে প্রতিবিম্ব করে সেটি আমরা ঠিকই দেখতে পাবো। সুতরাং কালো বস্তু সকল রংকে শুষে নেয়- ফলে আমরা একে কালো দেখি। অপরদিকে সবুজ বস্তু সবুজ ছাড়া বাকি ৬টি রং শুষে নেয়। সুতরাং সবুজ রং প্রতিবিম্ব হয়ে চোখে আসে- তাই একে সবুজ দেখি। তাহলে কী বুঝলাম?

(১) আলোকরশ্মি ৭টি রঙে তৈরি।



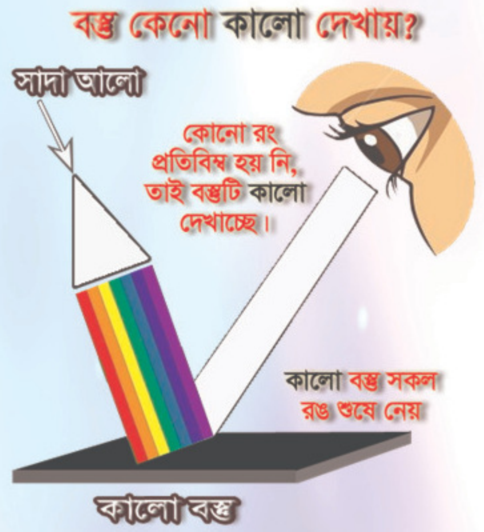
(২) যেসব রঙ রঞ্জ পদার্থ পছন্দ করে না, সে রঙের আলো প্রতিবিম্ব করে।

(৩) বস্তুর অপছন্দনীয় রঙের আলো আমাদের চোখে পতিত হয়।

(৪) বস্তুটিকে তাই এই পতিত রঙের আলোকেই আমরা দেখি।

(৫) যেসব বস্তুর পিগমেন্ট সকল রঙের আলো প্রতিবিম্ব করে ওগুলো আমরা সাদা হিসেবে দেখি।

(৬) যেসব বস্তুর পিগমেন্ট সকল রঙের আলো শুষে নেয় ওগুলো আমরা কালো হিসেবে দেখি।



আলো কিভাবে তৈরি হয়

আজকাল প্রায় সব ঘরে ঘরে এসেছে বিদ্যুৎ। এখন তাই আগের মতো ক্যারোসিনের বাতি, লন্টন ও মোমবাতি খুব একটা দেখা যায় না। একটি লাইট বাল্বে কীভাবে আলো তৈরি হয়? এ প্রশ্নের জবাব পেতে প্রথমে জানতে হবে আলোর মূল সূত্র কী?

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, বস্তুর মধ্যে এনার্জি বা বল- যেমন উচ্চ তাপ এনার্জি, পতিত হলে অণু-কণায় পরিবর্তন ঘটে। বস্তু এই পরিবর্তন হেতু আলোকরশ্মি তৈরী করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। যেমন এক টুকরো কাগজে আগুন লাগালে তা জ্বলতে থাকে এবং সাথে সাথে চতুর্দিকে আলো ছড়িয়ে পড়ে।



আলো তৈরির ক্রিয়া

আমরা আগেই জেনেছি আলো মূলত ইলেকট্রম্যাগনেটিক তরঙ্গ। তাহলে বুঝা গেলো সকল আলোকসূত্র থেকে এনার্জির কারণে সৃষ্টি হয় এই তরঙ্গ এবং তা চতুর্দিকে দৃশ্যমান আলো ও অদৃশ্য এনার্জি হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে। নিচের চিত্রে আমরা সর্বনিম্ন স্তরে আলোকরশ্মি সৃষ্টির মৌলিক ক্রিয়াটি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ভালো করে না বুঝলে ভেবো না- বড় হয়ে এ ব্যাপারে আরো লেখাপড়া করলে ঠিকই বুঝতে পারবে।

কিভাবে রংধনু তৈরি হয়?

তোমরা নিশ্চয় রংধনু দেখেছো। গ্রামবাংলায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশে দিনের আলোকে সাতটি রং নিয়ে এই রংধনু দৃশ্যমান হয়।



অপূর্ব সুন্দর এই রংধনু কিভাবে তৈরি হয়? জবাব জেনে নিই, কেমন?

আকাশে ভাসমান জলীয় বাষ্প যখন ঠাণ্ডা হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানির ফোটা ও বরফখণ্ডে পরিণত হয়, তখনই আমরা মেঘমালা দেখতে পাই। পানির ফোটা ভারী হয়ে আসলে তা বৃষ্টি আকারে পৃথিবীতে নেমে আসে। এই পড়ন্ত বৃষ্টির ফোটাগুলোর ভেতর দিয়ে



যদি সাত রংবিশিষ্ট সূর্যের দৃশ্যমান আলো একটি বিশেষ কোণে প্রবেশ করে তখন রংধনুর সৃষ্টি হয়। একটি কৃত্রিম তিনফলা কাচ (prism) দ্বারাও সূর্যের আলোকে সাতরংয়ে বিভক্ত করা যায়। এবার জেনে নিলে কিভাবে রংধনু তৈরি হয়। রংধনু সব জায়গা থেকে সবাই দেখতে পাবে না- দেখার জন্য বিশেষ জায়গায় থাকতে হবে। দেখো উপরের চিত্রটি।

আমরা আলোকবিজ্ঞানের ওপর বেশ কিছু শিখলাম- তাই না? এই সিরিজের অন্যান্য বইও পড়বে। বিজ্ঞানের জগৎ কী অপূর্ব ও চিত্তাকর্ষক তা তোমরা জানতে পেরে সত্যিই আনন্দ পাবে।

সমাপ্ত